Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 493 – 506
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'তবু কেন এমন একাকী?' : এক ফিলোজফিক্যাল ইনভেস্টিগেশন

গণেশ যোদ্দার
প্রাক্তন গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : joddarganesh@gmail.com

Keyword

Self, fright, recollection, known, pain, alone, sense, oneness, similar.

Abstract

All are alone and a few in and beyond the thoughtful world. Now belief and disbelief have turned into mere madness and incoherent utterance. Social distance has lost individual reciprocity. He has been by and by isolating from simultaneous geographical and mental state. A few self-devised words– Impossible! Misunderstanding! Boring! Disgusting! Rubbish! Ineligible! Intolerable! -- are echoing in the bankrupt minds. Man is nearing non-existence from existence in the word-fright. The thought process of man is also shrinking due to instinctive behaviouralism. Lively animation is on the verge of habitual animation. There are people who can be communicated with. Time is infinite too. But the scarcity of words. The feeble 'I' of self-confined man has forgotten to feel and taste the gratification. Self-amorousness has been monotonous too to the self-forgetful generation. Now the entire globe is at the threshold of the crisis of our supreme being due to irreparable loss and unexpected injury. But for a compact ending of plays associated with human life, nobody pays attention to the rest of machine-led lives from the acts of queer kind being played in the global theatrical stage. So the time for self-introspection is ahead. Now it is the supreme time to have what is always beyond our reach. It is also the appropriate time to explore the intuition of mind and human being lost. A sort of seclusion exists behind such a creative portraiture. But no one needs to go to isolated forest and summit of hills for such seclusion. As freedom can be tasted from countless bondages of the mundane world, revelation of self-freedom can be attained in the expression of sensuousness. At the same time, emancipation can be met. A stark contrast is hidden in this truth in the time of new humanisation. It is evident on the one hand that universal life is being destabilized by fragmentation. On the other hand, it is equally true that the fatality of death is being avoided and excellent creations are being innovated by the man himself. In the realm of regular circumstances, the fetus of imagination, for the sake of its outcome, has tried to feel the pleasure of creation. But it has been witnessed that this peace of creation has deserted the man. Then the questions related to the

happiness of the earthly life begin to come in contact with the isolated human minds -- Why such solitude yet?" Why do human beings think that they are alone after attainment and possession of everything? The quest for its apt answer is the focused subject matter of this essay entitled not only with special reference to the poem 'Bodh' by Jibanananda Das but many philosophical and rational citations from Bengali literature. Even in the circumstantial crisis of life the semi-conscious and hostile human minds get addicted more to the application of the conjunction 'still' the justification of which is another remarkable aspect of this discourse. Not only that, the essayist is out and out focused and will shed light on how and why 'জানিবার গাঢ় বেদনা' makes the man bound to solitude. Finaly why man will accept the expedition from the intention of 'oneness' and sail to purgation from the material earth will be the sole priority of this discourse with the help of analytical research and philosophy-embedded discussions.

Discussion

বিশাল বাংলা সাহিত্যের সুগভীর সমুদ্র থেকে তিনজন ভাবুকের তিনটি অসামান্য উদ্ধৃতি চয়ন করে নেব। যেখানে প্রদত্ত হয়েছে একাকীত্বের স্বরূপ ও সংজ্ঞায়ন।

প্রথমত : মরমী সাধক লালন শাহ্-এর থেকে —

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
... ...
আবার সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।"[১]

(অর্থাৎ, এক সঙ্গে থেকেও লক্ষ যোজন দূরত্ব অনুভব করাকে একাকীত্ব বলে।)

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরর থেকে —

"জয়সিংহ।। কেবলই একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক থেকে জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ-সম, তখন কোথায়
সুখ; কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?
অপর্ণা।। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে–
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।"[২]

(অর্থাৎ, হৃদয়ের-ধন সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থেকেও, নেওয়ার মানুষ যখন থাকে না তখন তাকে একেলা বা একাকীত্ব বলে।)

তৃতীয়ত, জীবনানন্দ দাশ থেকে —

"সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?"[৩]

(অর্থাৎ, সবার সঙ্গে সব ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেও নিজেকে আলাদা মনে করাকে বলে একাকীত্ব।)

উপরের তিনটি উদ্ধৃতি থেকে একাকীত্ব কাকে বলে তা অন্তত আমরা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু দুটিতে থেকেও কেন মানুষ 'এক' হতে চায়? কেন একা একা লাগে? 'এক'-ই বা কে? 'একা'-ই বা কে? কে-ই বা একাকী? 'এক' না হতে পারলে কেউ 'একা' হতে পারে কি? তাছাড়া 'আমি' ডুবে না গেলে কেউ 'এক' হতেও তো পারে না! আরো আরো 'বেদনা'য় মানুষ 'আমি'কে চেনে মাত্র। আরো আরো 'চেতনা' জাগলে পর রুদ্ধ গবাক্ষ উন্মুক্ত হয়। তখন আরো আরো 'প্রেমে' ডুবে যায় অহং। মদীয়তা থেকে নেমে আসে তদীয়তায়। মমতা থেকে নেমে আসে সমতায়। তখনই তো মানুষ 'এক' হতে পারে। আসলে একাত্ম হয়। নচেৎ নয়। তাই এই 'এক' হতে না-পারার যন্ত্রণাই বুঝি একাকিত্বের যন্ত্রণা।

আসলে মানুষ মাত্রই তো জন্ম একা। তাকে এক হতে হয়। জীবনভর এই এক হওয়ার সাধনা। একা সীমায়িত, এক সীমাহীন। একা ব্যক্তিক, এক নৈর্ব্যক্তিক। না, এখানে কোনো ঈশ্বরকে 'এক' বোঝানো হচ্ছে না। 'এক' আসলে মনের একটি অবস্থা বা ভাব বিশেষ। ঈশ্বর বিশ্বরূপ দেখাতে পারেন। 'একা' হয়ে 'এক' হতে পারেন কি? সাকার ঈশ্বরের অনেক নাম। অনেক ডাক নাম। অনেক নামডাকও। অর্থাৎ ঈশ্বরের ডাক শোনার লোভ যেমন প্রবল, তেমনি প্রবল তার ক্ষমতার জাহির। কিন্তু তিনি এক হতে পারেন না। নামী ঈশ্বর কখনো চতুর্ভুজ, কখনো দশভূজা, কখনো দ্বিভুজা, কখনো পঞ্চানন, কখনো ত্রিনয়নী। কিন্তু নামহীন একের হাত, পা, স্কন্ধ, মাথা কিছুই থাকে না। অহংশূন্যে ভেসে থাকেন। আর এই আকারহীন ঈশ্বর আমাদের কাছে 'তিনি', 'আমি', 'তুমি', 'আপনি'তে পরিচিত। কেননা তিনি অপূর্ণ। আর অপূর্ণ ঈশ্বর বা বেদনার্ত ঈশ্বরই এক হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তাই তো দেখি ত্রিগীত পর্বের কবিতায় (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি) এই 'আমি-তুমি'র দ্বিরালাপে ভাষা পেয়েছে আত্মমগ্ন পথিক ও পান্থ জনের সখার মধ্যেকার অপূর্ণতার বেদনা। যেখানে 'আমি'র প্রধাবন 'তুমি'র অভিমুখে এবং 'তুমি'র অবতরণ 'আমি'র প্রাণপূরে–

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।।"[৪]

এবার 'এক', 'একা' ও 'একাকী' কে বা কারা একটু দেখে নিই –

- একা কে?
- সুখ চায় যে সে একা।
- জাতক মাত্রই একা।
- যার মধ্যে মমত্ববোধ অতি প্রবল সে একা।
- যে ভরা মনে দেওয়ার জন্য বসে আছে, কিন্তু নেওয়ার কেউ নেই- সে একা।
- একাকী কে?
- দুঃখের অভাব আছে যার সে একাকী।
- দুঃখকে যে বিলাসিতা ভাবে সে একাকী।
- হয়ে-ওঠা মানুষ একাকী।
- নিজেকে জানতে না পারার বেদনায় দগ্ধ হওয়া মানুষ একাকী।
- সংশয়ী মানুষ একাকী।
- সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে আলাদা মনে করে যে-মানুষ সে একাকী।
- যে-মানুষ কর্ম থেকে, সমাজ থেকে, নিজের থেকে এমনকি সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে সে একাকী।
- 'এক' হতে পারে কে?
- একত্ববোধ জন্মেছে যার সে-ই এক হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

- দুঃখকে স্বীকার, অর্জন ও জয় করেছে যে সে-ই এক হতে পারে।
- বেদনাকে মেনে ও মনে নিয়েছে যে সেও এক হতে পারে।
- নিজের ডাকে একলা চলা মানুষ এক হতে জানে।

এখন বলা হল, সুখী মানুষ একা। কিন্তু সুখ কি? চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় - ধরনের উপাদেয় ভোজন এবং পরনিন্দা ও পরচর্চা ভজন কি সুখ? না কি তমোনিদ্রা ও দিবাস্বপ্নই সুখ? পাঠক বলবেন, এ সুখ জৈবিক সুখ। ঠিকই। অজৈবিক সুখও বলে 'যশোদেহি'। কি না যশ দাও। খ্যাতি হোক। নামে পরিচিত হবে আর কি। যশ যদি কারণ হয়, সুখ তার ফল। তাহলে এই সুখের উপায় কি? অর্থ – এই সুখের উপায় হল অর্থ। তবে অর্থ দ্বারা দুটি জিনিস হয় - এক প্রচুর সুখ হয়; আর দুঃখ দূর হয়। তবে দুঃখকে চেনা যায় না। কিন্তু দুঃখকে না চিনতে পারার কারণেও ফের দুঃখ জন্মে। তাই সুখও এক প্রকার দুঃখ বৈকি। সেকারণে সুখী মানুষ একা। তাছাড়া খ্যাতির ফলে ব্যস্ততা নামক এক ভাইরাসে সে সংক্রামিত হয়। অন্যের পরশ যেমন পায় না, তেমনি খ্যাতির কারণে ভক্তচাপ ও রক্তচাপ দুই-ই বেড়ে যায়। নিজের ছায়াকে মস্ত করে দেখে। অন্যকে দেখতে পায় না। তাছাড়া সুখ, যশ, খ্যাতি এরা নিজেরাই তো একা। তাই এদের প্রতি আসক্ত যারা তাদেরকেও একা করে দেয়। 'ওর এখন ব্যাপার স্যাপার আলাদা' -- এই দূরত্বজ্ঞাপক বাক্যবন্ধ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বন্ধু পরিজন আত্মীয় স্বজনের থেকে এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের বিচ্ছেদ তৈরি হয়। তখন একা লাগে বৈকি। আবার যশ বা খ্যাতিকে যারা জীবিকা করে তারা বিষয়ী মানুষ। সম্পত্তি বৃদ্ধি ও রক্ষা করার জন্যই জন্মে ও মরে। দোয়েল ফিঙে ও ফড়িংয়ের মতন জীবন যাপন করে। তাই সুখ বিষয়ী মানুষকে একা বানায়। ভাবে তার মত ধনী কেউ নেই। তাই সেও একা হয়ে যায়। সুখী ব্যক্তিও অমৃতের পুত্র। তবে তা গরলের বিপরীত। বিষয়-সুখী মানুষের সুখ আছে ঠিকই, নেই সুখের অনুভূতি। তাই সুখ ও দুঃখের ওপারে যে আনন্দ তাকে সে আস্বাদন করতে ভুলে যায়। সেই জন্য আনন্দ-বঞ্চিত সুখী মানুষ একা।

দ্বিতীয়ত বলা হল, মানুষ মাত্রই জন্ম-একা। জন্মসূত্রেই সে মিথ্যার মায়াজালে আবদ্ধ। বিভিন্ন মায়িক সম্পর্কের সূত্র গড়তে থাকে ছোট থেকেই। বিশ্ব-ভরা প্রাণের মাঝে এভাবে যুক্ত হতে থাকে ধীরে ধীরে। এই জন্ম-একা মানুষ হয় সবটা পায়, নয় তো সবটা হারায়। অর্থাৎ সব না-পাওয়াতেই ঝুলি ভর্তি করে। এরপর 'তারে' খুঁজতে গিয়ে 'তাঁরে' ভুলে যায়। অর্থাৎ নিজের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। নিজেকে নিজের ভালোবাসাতে পারে না। তাই তার একা লাগে। তাছাড়া এই জন্ম-একা মানুষদের কাছে প্রণয়-কলহ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বিরহ আসে না। এমনকি পঞ্চবানের দহন ও দাহন ভিন্ন আর কোনো পীড়নও তারা সয় না; দেয়ও না। এরা আদিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ছাড়া কখনো সন্তপ্ত হয় না। যা দুঃসাধ্য, যা দুর্গম্য সেখান থেকে হিরে মানিক আনতে পারে কিন্তু সহজের থেকে প্রাণের স্বাদটুকু কাড়তে পারে না।[৫] এরা দুঃখকে এড়িয়ে চলে। দুঃখও ওদের পিছু ছাড়ে না। তখন একা একাই লাগে। তাই একদিন বোঝে "মরণের পরপারে বড় অন্ধকার।"[৬] তখন সব পাওয়া ও না-পাওয়া নিয়ে ঘাটে বসে। জীবন-যৌবন-ধন-মান কালস্রোতে সব তরী বোঝাই করে নিয়ে পালায়।

তৃতীয়ত বলা হল, মমত্ববোধ বা অহংত্ববোধ যেসব মানুষের মধ্যে প্রবল তারাও একা। অহং মানুষ মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো। তীব্র খরসান দীপ্তি তার সাধনা। বিশ্বসংসারকে পোড়ানোই তার কাজ। কিন্তু সেও একা, কেননা সে নিজেও পোড়ে। 'রক্তকরবী'র মকররাজার মতন অহংয়ের জাল এতই বিস্তৃত যে, বিশ্বসংসারকে সেই জালে আবদ্ধ করে। কিন্তু দুর্বল ঘাসের প্রাণকে আপন করতে পারে না। অহং-এর দ্বারা দেহে জোর পায়, মনের জাদু পায় না। অহং অন্যকে হারাতে শেখায়, হারতে শেখায় না। আর আত্মবিবেকের কাছে হার স্বীকার না করলে তো নত হওয়ার ভাব বা বোধ জন্মায় না। ক্লান্তি থেকে তেমনি আনন্দে পৌঁছতে পারা যায় না। আর তখন তো একা একা লাগবেই। শুধু তাই নয়, অহং স্বভাবের মানুষ নিজেকে 'প্রকাণ্ড' বা 'ভয়ঙ্কর' ভেবে মনে করে 'আমিই সব'। স্ব-অধীন নয়, ভাবে স্বাধীন। কিন্তু সে যে পরোক্ষে অহং-এর অধীন হয়ে পড়ছে তা ভুলে যায়। অহং-এর কারণেই সে ধীরে ধীরে স্ববিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেননা অহং থেকে আসে প্রভুত্ব। প্রভুত্ব আনে প্রতিপত্তি। প্রতিপত্তি থেকে আসে আসক্তি। আসক্তি থেকে জন্ম

নেয় ক্রোধ। ক্রোধ মানুষকে অসংযমী করে তোলে। আর অসংযমী মানুষ নিজেকেই হারায়। তাই অহং এইভাবে অন্য প্রিয় মানুষদের থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়। তখন একা একা তো লাগবেই।

এখন এই 'একা' হওয়ার পিছনে 'জানিবার গাঢ় বেদনা'[৭] কিভাবে অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। প্রথমে দেখি 'জানা' বলতে কি বোঝায়? 'জানা'-কে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে –

- অন্বেষণ অর্থে : আত্মজ্ঞান অন্বেষণ করা। (যাজ্ঞবল্ক্য মুনিপুত্র নচিকেতার জানা)
- অনুসন্ধান অর্থে : কার্য ও কারণের পরম্পরা অনুসন্ধান করা। (সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের জানা)
- উদ্ঘাটন অর্থে : সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। (অয়দিপাউসের জানা)
- আবিষ্কার অর্থে : নিজেকে আবিষ্কার করা। (রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের জানা)

মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই জানার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। তবে 'জানা' আর 'জানতে চাওয়া' এ-দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। জানা হল নির্বিশেষ জ্ঞান। আর 'জানতে চাওয়া' হল এক ধরনের প্রার্থনা বিশেষ। তবে এই জানার ইচ্ছা যাদের মধ্যে প্রবল তাদের মনে পড়বে 'অয়দিপাউস' নাটকে থেবাইয়ের রাণী ইয়োকাস্তের সতর্কবাণীটি –

> "হায় হতভাগ্য মানুষ নিজের ইতিবৃত্ত তুমি কখনো না জানো।"[৮]

অয়দিপাউসের অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যের আসল সত্যতা উদঘাটনে বাধা দিয়েই রানীর এই সতর্কবাণী। কিন্তু আপন সৃষ্টির কাহিনীকে অন্ধকারের উৎস থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য তৎপর অয়দিপাউস। না-জানা থেকে জানায় পৌঁছতে সে লালায়িত। তার জানিবার উদগ্র বাসনার পিছনে ছিল অসংযত কৌতুহল এবং দেবতার ক্ষমাহীনতা। কিন্তু কি সেই জানা, যার জন্য অয়দিপাউসের অতীত কলঙ্কিত, বর্তমান প্রহেলিকাময়, আর ভবিষ্যৎ দুর্নিরীক্ষ্য। না, সেই 'জানা'টি হল–

এক. অয়দিপাউস নাকি নিজের হাতে তার পিতাকে হত্যা করবে।

দুই. সে নাকি তার মাকে বিয়ে করবে এবং মায়ের শয্যা কলঙ্কিত করবে।

নাটকটির শেষে এক মেষ পালকের কথায় জানা যায় যে, রাণী ইয়োকাস্তের গর্ভের সন্তানই অয়দিপাউস। আবার অয়দিপাউস যাকে হত্যা করেছে সেই লাইয়াস একদিকে ইয়োকাস্তের স্বামী অন্যদিকে অয়দিপাউসের প্রকৃত পিতা। এদিকে আবার বর্তমানে ইয়োকাস্তে হল অয়দিপাউসের স্ত্রী, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে-ই অয়দিপাউসের মা। এখন সৃষ্টির এই অজানা কাহিনি যখন অন্ধকার থেকে উঠে আসলো, তখন সেই জ্ঞানের অন্বেষণের বেদনায় ইয়োকাস্তের আত্মহত্যা করল। আর সব সত্য জানার বেদনায় ও বিড়ম্বনায় নিজেই নিজের চোখকে অন্ধ করে দিল অয়দিপাউস। চাহিদা পূরণের 'ঐশ্বর্য', 'সুখ' ও 'সৌভাগ্য' সব ছিল কিন্তু 'অপমান', 'মৃত্যু' ও 'সর্বনাশ' – যা কিছু দুর্ভাগ্য মানুষে কল্পনা করতে পারে সব বর্ষিত হল অয়দিপাউসের উপর। সেই তো প্রকৃত একাকী।

এখন প্রশ্ন, মানুষ জানে কেন? কিছু না জানা যেমন মূঢ়তার পরিচয়, সব জানাও তেমনি রূঢ়তার সমান। তবে মানুষ জানে তার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। সে জানা উপরিতলের সত্যকে জানা। আবার অসত্যকেও জানা। সে জানাতে বিষয়কে জানা হয়, কিন্তু বিষয়ীকে জানা যায় না। বিষয়ীকে জানার জন্য মানুষ 'আরো আরো' -এর সন্ধান করে ফেরে। বাহির বিশ্বকে জানা ফুরালে পর আসল জানার ক্রিয়া শুরু হয়। তখন অন্তর বিশ্বকে জানতে শুরু করে। বাহির বিশ্বকে জানা তো নিজের জন্য নয়, অপরকে জানানোর জন্য। সেখানে জানা একটি কাজ বা অ্যাকটিভিটি। আর জানানো হল তার ফল। নিজের পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায় মাত্র সেখানে। সক্রেটিস বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন —

> "আমি পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী? অথচ আমি তো মুখ্যুসুখ্যু লোক, কিছুই জানি না।...আশ্চর্য, দেখলাম প্রত্যেকের জ্ঞানের প্রচণ্ড অহমিকা। কেউ জানে না যে সে যতটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বেশি তার অজানা। সত্যিই আমি সবচেয়ে জ্ঞানী, কারণ আমি জানি যে আমি জানি না।"[৯]

তাই তো নিজেকে জানা তাঁর পক্ষেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। দেলফির মন্দিরেও ঘোষণা হল সক্রেটিস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষ। অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই 'জানা' কাজটি যত বাড়তে থাকবে ততই সত্য তার কাছে বারবার উন্মোচিত হতে থাকবে। আপনাকে এই জানা মানুষের চিরন্তন। তাইতো যে-জানা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল ধারনা মাত্র – যেমন রজ্জুতের সর্বভ্রমের মতো – যা কিনা প্রাতিভাষিক জ্ঞান; সেই জানা একসময় আত্মলব্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়। অজানা সত্য তখন জানা সত্যে ধরা দেয়। দেখার দৃষ্টি যায় বদলে। এতদিন সে যে জানতো না, এখনও যে তার জানা অপূর্ণ থেকে গেছে – সেই জানাটি যখন সে জেনে যায় তখনই তো 'জানিবার' এই অভীপ্সা মানুষকে বেদনা দেয়। সে বেদনায় এতই প্রগাঢ় যে তীরের ফলা হয়ে মর্মে বেঁধে।

তবে জীবনানন্দ যখন 'জানিবার বেদনা'র কথা বলেন তখন তা কি 'জানতে না পারার বেদনা'র কথা বলেন? না 'বেদনাকে না-জানার বেদনা'র কথা বলেন? দুটোর কোনটা? যদি বলা হয়, 'জানা-প্রশ্ন' আর 'প্রশ্ন-জানা' কথা দুটির মধ্যে পার্থক্য কি? তাহলে উত্তর আসে এই রকম -

- জানা-প্রশ্ন : অর্থাৎ এ প্রশ্নের উত্তর জানা আছে।
- প্রশ্ন-জানা : অর্থাৎ এখানে উত্তর তো চাওয়াই হচ্ছে না। উত্তরের কোন প্রসঙ্গই নেই। শুধু প্রশ্ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে বলছে। অর্থাৎ একটি প্রশ্ন কেমন করে যথার্থ যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন হয়ে ওঠে তা জানা। আর তাই যদি হয় তাহলে সেই সূত্র ধরে বলা যায় -
- জানিবার প্রশ্ন : অর্থাৎ এমন এক প্রশ্ন যা না জানলে জীবন বৃথা। জানার মতো প্রশ্ন।

  সেহেতু বলা যায় –
- জানিবার বেদনা : এমনই এক বেদনা যা না জানলে জীবন বৃথা। জানার মত বেদনা।

  আর একটা বিষয়, জীবনানন্দ 'জানিবার' শব্দ ব্যবহার করলেন। তিনি 'জানবার' শব্দ ব্যবহার করলেন না। কেন করলেন না? আসলে –
- জানবার বেদনা : জগৎ অস্তিত্বকে না-জানা-জনিত বেদনা ('জানবো এবার জগৎটাকে')
- জানিবার বেদনা : মানব অস্তিত্বকে না-জানা-জনিত বেদনা। অর্থাৎ 'ছিল', 'আছে' ও 'থাকবে' এই তিনটি অস্তিত্বের স্বরূপকে না-জানার বেদনা। কিন্তু কী সেগুলি? —
- ছিল : মানব অস্তিত্বের তথা মানব চেতনার ক্রিয়ার নিদর্শনকে জানা বোঝায়।
- আছে : মানব অস্তিত্বের যুগপৎ প্রাক্তন-বর্তমান এবং জায়মান-বর্তমানের স্বরূপ জানা।
- থাকবে : মানব অস্তিত্বের অথবা মানব চেতনার প্রবাহমানতার প্রতি আস্থাশীলতা ও তার সচলতার ইঙ্গিত প্রদান এবং পরিশেষে 'আছে, আছে, আছে'- এই বোধের প্রতি যে বিশ্বাস — তাকে জানা। জীবনানন্দ তো এই জানাকেই বেদনার মতো মহীয়ান করে তুলতে চেয়েছেন।

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, তমসা নদীর তীর থেকে উঠে এসে বাল্মীকি দেখলেন যে, এক ব্যাধ মিলনরত দুটি পাখির মধ্যে পুরুষ পাখিটিকে শরবিদ্ধ করেছে এবং স্ত্রী পাখিটি মৃত পুরুষ পাখিটিকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে আর হাহাকার করছে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁর হৃদয়ের শোক ভাব থেকে করুণ রসে বেরিয়ে আসে –

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"[১০]

এরপর বাল্মীকি ভাবলেন, 'কিমিদম্ ব্যবহৃতং ময়া'[১১] অর্থাৎ আমার দ্বারা এ কি প্রকাশ পেল? এই জানিবার বেদনা কবিকে পীড়িত করতে লাগলো। ভরদ্বাজ ঋষি কর্তৃক আকাশবাণী হল যে, কবির মুখ থেকে যা বেরিয়ে এল জগতে তা শ্লোক নামে পরিচিত হবে। কেননা তা শোক ভাব থেকে জাত তাই। অর্থাৎ বাল্মীকির এই জানার মূলে কিন্তু সেই শোক-সন্তাপ-বেদনা। যে বেদনাকে না-জানার মুহূর্তে তিনি 'একাকী' হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যেই বেদনার স্বরূপ জানতে

পারলেন অমনি তিনি 'এক' হওয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অর্থাৎ মর্মাহত স্ত্রী পাখিটির সঙ্গে তাঁর মনের অবস্থা সমরূপতা পেল।

তাহলে গাঢ় হোক আর হালকা হোক 'জানিবার বেদনা' যখন বলা হচ্ছে তখন প্রকারান্তরে এটিই বলা হচ্ছে না কি যে, এ বেদনা এমন এক অপার্থিব বেদনা, যাকে না জানা হলে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হবে। দোষী মনে হবে। অপরাধী মনে হবে। তাহলে জীবনানন্দ বুঝি এহেন মহান বেদনাকেই জীবনভর 'জানিবার' বিষয় ভেবেছেন, যা হৃদয় খুঁড়েই জেগে ওঠে। অর্থাৎ 'আরো আরো' বেদনার বোধ না জাগলে মানুষের 'আরো আরো' জানা যেমন পূর্ণতা পায় না; তেমনি নিজেকে জানার পর মানুষ যদি বেদনার আগুনে নিজের মিথ্যে-অভিশপ্ত-অপরাধী-প্রতারক 'আমি'কে না ঝলসে নেয় তাহলে তার জানাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই বেদনার্ত সত্তাই একমাত্র জানতে সক্ষম হয়। আর 'জানা'-র পরিণতিতেও আরও জানার জন্য গাঢ় বেদনা জন্ম নেয়। আর জানিবার সেই গাঢ় বেদনায় দীর্ণ মানুষ তো প্রকৃতই একাকী।

তবে এই 'জানা'কে কেউ যখন বৃত্তি বা পেশা কিংবা যশ বা খ্যাতি অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে তখন সেই জানা থেকে বেদনা নয়, আসে সুখ, আসে অর্থ। আর সুখ বা অর্থ মানুষকে একা করে কিন্তু এক করে তোলে না। পুনরুক্তি করেই বলতে হয়, যশ-খ্যাতি-নাম-ডাক যখন হয়ে যায় তখন 'জানা' থেকে মানুষ বিবিক্ত হয়ে পড়ে। প্রকাশ অপেক্ষা প্রচারের প্রতি মানুষ অধিক আসক্ত হয়ে পড়ে। অল্প-জানাকেই, অর্থকে জানাকেই, সুখকে জানাকেই প্রকৃত জানা ভাবে সে। তবে খ্যাতিমানকে যশস্বীকে সমাজ উঁচুতে তুলে রাখে। কেউ পৃষ্ঠে পোষকতা করে। কেউ করমর্দন করে। কেউ শ্রীচরণ ধুয়ে দেয়। এই ভাবে তাকে বুঝিয়ে দেয় 'তুমি আলাদা'। সে নিজেও ভাবে যে 'আমি বুঝি সত্যি আলাদা'। এই আলাদা মানুষ ক্রমশ স্ব স্ব সমাজ থেকে চ্যুত হতে হতে স্ব-সত্তাচ্যুত হয়ে আত্মবিচ্ছিন্ন মানবে পরিণত হয়। তখন নিজেকে জানার জন্য – আপনার কৃতকর্মের ফলের জন্য অনুতপ্ত হন। এই আপন স্বভাবের ও স্বরূপের চরিত্র উদঘাটনে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যায়িত করে থাকেন। তবুও 'আপনাকে এই জানা' আর ফুরোয় না। তখনই তো আসে বেদনা – জানার বেদনা।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য, 'জানা' বা 'না-জানা' যাকেই জানিনা কেন, তার জন্য জানা-মানুষ দরকার। অজানা-মানুষ নয়। কেন নয়? তা এই কারণে– অজানা মানুষ কখনো এটা স্বীকার করেন না যে, তার আরো আরো না-জানা আছে। জানার অভাব আছে। অজানা মানে নয়-জানা – নঞ্ তৎপুরুষ সমাস। আর না-জানা মানে জানার অভাব – অব্যয়ীভব সমাস। জানার এই অভাববোধ আছে একমাত্র জানা-মানুষেরই। তাই তো জানা তার কাছে বেদনা জাগায়। 'আমার অনেক জানা আজও বাকি আছে' – এই বেদনার অনুভব মানুষকে একা করে দেয়। তাহলে 'জানিবার বেদনা' দুই প্রকৃতির – একদিকে সমস্ত জানিবার বেদনা, অন্যদিকে সমস্ত না-জানিবার বেদনা।

এখন এই 'জানা' অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞান এই সত্য তুলে ধরে যে, 'সহজ লোক' যারা কিনা দ্বন্দ্বশূন্য মানুষ, কিম্বা 'সকল লোক' যারা কিনা নিছক জৈবিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত মানুষ – যারা 'বীজ বোনার জন্য ফসলের আকাঙ্ক্ষায়' বলা ভালো সন্তান উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর বীজখেতে অর্থাৎ সংসার মিথুনাগারে এসেছে কিম্বা বারবার আসে তাদের হৃদয়, তাদের বুদ্ধি, তাদের স্বপ্ন ও তাদের ভাষা আর 'জানা-মানুষে'র হৃদয়, বুদ্ধি, স্বপ্ন ও ভাষা কখনও এক নয়। তাইতো কবি জীবনানন্দ দাশের আত্ম-জবানবন্দী -

"জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে –
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
... ...
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি? তাহাদের মন

আমার মনের মতো না কি?
—তবু কেন এমন একাকী?"[১২]

আসলে এই 'একাকী' বোধ হওয়া মানুষটির অজানা বা অপ্রাপ্তি কিছুই নেই। চাকরি, বাড়ি, স্ত্রী, সন্তান ও সুস্বাস্থ্য যাবতীয় মৌলিক চাহিদা সবই পূরণ হয়েছে তার। 'শরীরের স্বাদ' এবং 'প্রাণের আহ্লাদ' দুই-ই পেয়েছে সে। পেয়েছে নারীর ভালবাসা, উপেক্ষা ও ঘৃণা। তেমনি নারীকে ভালোবেসে, অবহেলা করে, ঘৃণা করে 'যে জানা' তাও সে জেনেছে। 'মানুষের মুখ', 'মানুষীর মুখ' ও 'শিশুদের মুখ' দেখে আহ্লাদও পেয়েছে সে। যদিও তার মনে হয়েছে এইসব স্বাদ "নষ্ট শসা–পচা চালকুমড়ার ছাঁচে গড়া"[১৩] জগত সংসারের সাধারণ মানুষের স্বাদ। যার সঙ্গে তার মেলেনা। তাইতো তার "মাথার ভিতরে/ স্বপ্ন নয়– প্রেম নয়– কোনো এক বোধ কাজ করে।"[১৪] যে বোধ "পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায়।"[১৫] কিন্তু পায় না। অথবা পাওয়ার জন্য যথাযথ ও সমপরিমাণ সময় আর অবশিষ্ট থাকে না। তখনই আসে বেদনা। আর সেই বেদনাই তো তাকে একাকী করে তোলে। কিন্তু কেন? আর এই 'কেন'র উত্তর খোঁজার জন্য 'তবু কেন এমন একাকী?' এই চরণটির মধ্যেকার পদগুলির বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা যাক —

- তবু - এটি সংশয়াত্মক অব্যয়। সব থাকা যখন না-থাকায় পরিণত হয়, সব চাওয়া যখন সব পাওয়ার প্রতিকূলে যায় তখন এই সংশয় জাগে।
- কেন - নিজেকে জিজ্ঞেস করা।
- এমন - একাকীত্বের ধরণ। যেমন, নিজেকে আলাদা ভাবা। সবকিছু থেকে আলাদা করে নেওয়া। নিজেকে অযোগ্য ভাবা। নিজের আধখানা মন বিপন্ন বিস্ময় হয়ে যাওয়া। সব সম্পর্ক অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া।
- একাকী - বোধাক্রান্ত মানুষের মনের বিকারের অবস্থা।

এখন এই 'তবু' কথাটির মধ্যে দু'রকম ভাব লুকিয়ে আছে। একটি সম্পূর্ণতার ভাব, অন্যটি অসম্পূর্ণতার ভাব। সম্পূর্ণতার ভাব বলা হচ্ছে এই কারণে, জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের যা যা প্রয়োজন সব সামগ্রীই তার আছে। বলা ভালো প্রয়োজনের থেকে তা বেশিই আছে। প্রয়োজনের জগৎ তাকে সুখ দিচ্ছে জেনেও কিছু মানুষ সেই সুখদায়ক উপাদানগুলির থেকে দূরে সরে আসতে চাইছে অ-প্রয়োজনের আনন্দের জন্য। যা কিনা তার মনের অসম্পূর্ণতার ভাব। তাই সব পেয়েও যখন মনে হয় আরো কিছু আছে বাকি; কিম্বা সব কিছুর মধ্যে থেকেও যখন মনে হয় কোনো কিছুর মধ্যে নেই– তখনই মানুষ 'তবু' এই স্ববিরোধী শব্দটি ব্যবহার করে। তবে দ্বান্দ্বিক মনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে 'তবু' শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক —

১. কাছে পেয়ে সঙ্গ-সুখ অনুভব করেও যখন একা মনে হয়,
২. সবার মধ্যে নিশ্চিন্ত অবস্থান করেও নিজেকে আলাদা মনে হয় যখন,
৩. মস্ত ধনীর মস্ত দারিদ্র্যের ভাব জন্মায় যখন,
৪. হয়ে ওঠার বাসনার কাছে যখন না-হওয়ার সাধনা পরাভব মানে,
৫. যা পাওয়া উচিত ছিল কিন্তু যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে যখন দুস্তর ফারাক তৈরি হয়,
৬. আলোহীনতায় অন্তরকে দেখতে চেয়েও চোখের আলোয় চোখের বাহিরকে দেখে যখন ক্ষান্ত হতে হয়,
৭. দুঃখকে জয় করার সাধনা নিয়ে পথ চ'লে যখন দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না,
৮. সস্তার নাম-যশকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন স্রোতের প্রতিকূলে চলতে শুরু করে,
৯. মানুষের আহ্বানে কেউ সাড়া না দিলে যখন নিজেই একলা চলে,
১০. ভালোবাসাকে যখন ধুলো আর কাদা মনে হয়,
১১. জীবন যত বড়; তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন মনে হয় যখন।

কিন্তু কেন আমাদের মনে এহেন সংশয় উদ্রিক্ত হয়? এখানে একটি বিষয় না বললে নয়, তা হল – জানা বা জ্ঞান দুই প্রকার। একটি কোনো বিষয়ে সংশয়শূন্য প্রকৃত অনুভব বা জানা অর্থাৎ প্রমা। আর অন্যটি কোন বিষয়কে বা বস্তুকে

তার স্বরূপে না জেনে ভুলবশত অনুভবহীন যে জানা সেটি হল অপ্রমা। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় দর্শনের প্রমা জ্ঞান চার প্রকার– প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দজ্ঞান। আর অপ্রমা জ্ঞানও চার প্রকার– স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম এবং তর্ক। 'তবু কেন এমন একাকী?' – এই বোধের মধ্যে 'তবু' কথায় একই সঙ্গে মিশে আছে বর্তমান ও অতীত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির জানা। 'আমার তো সবই ছিল এবং আছেও, তবু আমার কেন এমন হল' – এই যে 'সব থাকা' এর মধ্যেই তো প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা ও স্মৃতি দ্বারা জানা দুই-ই লুকিয়ে আছে। এমনকি 'কেন' কথার মধ্যে অপ্রমা জ্ঞানের সংশয়, ভ্রম ও তর্কও লুকিয়ে আছে। অনেকে বলবেন যে, 'কেন'-এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই যে সংশয়, ভ্রম ও তর্ক এগুলোর দ্বারা তো যথার্থ অনুভব হয় না, তাই এদের দ্বারা প্রকৃত জানা হয় না। কিন্তু আমরা বলব, সব জানা তো আর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারাই একমাত্র হতে পারে না। মানস প্রত্যক্ষেও তো আমরা অনেক বিষয় ও বস্তুকে জানি এবং সে জানাও জানা। অনুভব কি শুধুই বুদ্ধিগ্রাহ্য? যুক্তিগ্রাহ্য? তা কি হৃদয়গ্রাহ্য নয়? 'হৃদয়ের মাঝে বোধ জন্ম নেওয়া' মানুষটি যখন পৃথিবীর পথ পরিত্যাগ করে আকাশের নক্ষত্রের পথ অবলম্বন করতে চান; তখন কি প্রকারান্তরে এই অনুভবের জগতের কথা বলেন না কি? তাই প্রত্যক্ষকে সামনে রেখেও স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম ও তর্কের দ্বারা আমাদের জীবনে ও যাপনে যেসব দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় তাদেরকে জানি। জানি নিজেকেও। আর এই জানার মধ্যে যেহেতু দ্বিধা ও অপরাধবোধ মিশে থাকে তাই এই জানা আমাদের বেদনাই দেয়।

আর এই যে সংশয় তারও একটা কিন্তু মূল্য আছে। অনেকে বলতে পারেন, জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব নির্ণয়ে সংশয় বাধক। ভালো কথা। তবে এ কথা বলা যায় না কি যে, সংশয় জন্মায় বলেই আমরা জানার দিকে এগোই। এই সংশয় আছে বলেই মাথার ভিতরে 'তবু কেন এমন একাকী?' – এই বোধ জন্ম নেয়। সংশয় আছে বলেই সংশয় উত্তরণেরও চেষ্টা আছে। চেষ্টা আছে 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'[১৬] অন্বেষণে। সংশয়শূন্য মানুষ সুখী বটে। কিন্তু সংশয়পূর্ণ মানুষ জ্ঞানী। কেননা যেকোনো কিছুর কার্য-কারণের পারম্পর্যকে অনুসন্ধান করা আসলে জ্ঞানী বা সংশয়ী মানুষের কাজ। ফলে সেই অনুসন্ধিৎসার মধ্যে জানার বিষয় যে লুকিয়ে আছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সংশয় কখনো জ্ঞানের বাধক হতে পারেনা। 'আরো আরো' জানতে সাহায্য করে এই সংশয়। তাই তো 'তবু' কথার পরেই 'কেন' কথাটি উচ্চারণ করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ। আসলে দেখা উচিত যে সংশয়ের যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কিনা। যুক্তিযুক্ত কারণ থাকার ফলে যদি মনে সংশয় জাগে তাহলে সে সংশয় কখনো দোষের নয়। বরং তা সঙ্গত। অন্যপক্ষে কারণ থাকা সত্ত্বেও যদি সংশয় না জাগে, তাহলে ধরে নিতে হবে সংশয়ের অভাব আছে। মানে জানার অভাব আছে। এই জানবার অভাবও বেদনাদায়ক। তা হল না জানতে পারার বেদনা। আর তখন সংশয়ের অভাবের কারণে অন্ধভাবে মৌলিক বিশ্বাসের উপর আস্থা রাখতে হয়। তাইতো সংশয়হীন ভাবে যখন ভালোবেসে মেয়েমানুষের কাছে গিয়েছে বোধাক্রান্ত জনৈক পুরুষটি তখন বুঝেছে সে–

"আমি তার উপেক্ষার ভাষা/আমি তার ঘৃণার আক্রোশ।"[১৭]

কিন্তু যে মুহূর্তে সংশয়পূর্ণ জ্ঞানে অবহেলা করে, ঘৃণা করে দেখেছে মেয়েমানুষের তখন সে বুঝেছে–

"উপেক্ষা সে করেছে আমারে, / ঘৃণা করে চলে গেছে— যখন ডেখেছি বারে বারে।"[১৮]

কিন্তু চেনা, জানা ও বোঝার পরেও ভালোবাসা দিতে ও নিতে গিয়ে পুরুষটি বারংবার আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হচ্ছেন। তারপরেও এই জানা কিন্তু তার ফুরচ্ছে না। এই সংশয় ফুরোচ্ছে না। তাই তো বলতে বাধ্য হচ্ছেন–

"তবুও সাধনা ছিলো একদিন– এই ভালোবাসা।"[১৯]

তাই তার পক্ষে 'কেন'-এর উত্তর অন্বেষণ অধিক জরুরী হয়ে পড়ে।

এখন এইসব নিয়ে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিখিলেশের কথা। 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশ। সম্পন্নতার মধ্যে থেকেও যে বিপন্নতার কল্পনাকারী। বন্ধু সন্দীপের প্রতি বিমলার আসক্তি অনুভব

করলেও জোরগলায় প্রতিবাদ করেনি। বিমলাকে ভালোবাসতে চেয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর প্রতিও ছিল তার অকৃত্রিম ভালোবাসা। সুখী গৃহকোণে ফাটল ধরলে পর এহেন মানসিকতার নিখিলেশকে বলতে শুনি –

> "অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! ...যোগ্যের জন্য পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।"[২০]

আর নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসার জন্য এই যে 'অযোগ্য' ভাবা আর নিজেকে 'আলাদা' ভাবা একাকীত্বের ধারণায় সমার্থক। নিজের সঙ্গে নিজে যখন বোঝাপড়া করে জীবনে 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে চেয়েছিল নিখিলেশ, তখন ভালোবাসার জন্য কখনো দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো বা অসম্মান, এমনকি বিমলার মৃত্যুর মতন দুঃখকে পর্যন্ত কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে সে। আসলে অধিকারবোধহীন সম্পর্কে 'কেন'-এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই মানুষ একাকী হয়ে পড়ে। এমনই একাকীত্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সীতানাথ। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' -এর সীতানাথ চক্রবর্তী। প্রাণের সজীবতা যার কাছে অভ্যাসের সজীবতায় পরিণত হয়েছিল। অন্তরের ঔৎসুক্য যার কাছে ধরা দিয়েছিল অভ্যাসেরও ঔৎসুকক্যে। যার জীবনের সঙ্গী কণা পরিণত হয়েছিল অভ্যাসের সঙ্গীতে। রাশি রাশি মিনিট, ঘন্টা, দিনের অভ্যাসের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যে কিনা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিল আত্মহত্যায়। যার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই সীতানাথ একাকীত্ব থেকে, নিঃশব্দে নীরবে বাঁচা থেকে নিষ্কৃতি পেতে "কড়িকাঠে গাঁথা বাঁকানো লোহার হুকে পরম মুক্তির আশ্বাস"[২১] পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন তার বন্ধু শরদিন্দুর কাছে হাজির হয়, শরদিন্দু তাকে চিনতে পারে কিন্তু ঠিক সহজভাবে বুঝতে পারে না। তখন সীতানাথ আর শরদিন্দুর মধ্যে যে সংলাপ আমরা শুনতে পাই তা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা গেল না —

> "সীতানাথ।। আমিও তাই বলছি। বুঝতে পারলে না। তোমার স্ত্রী বুঝতে পারলো না। কণা বুঝতে পারলো না। কেউ বুঝতে পারলো না! কি করে বুঝবে? সহজ কথা যে?
> শরদিন্দু।। সহজ কথা হলে বুঝতে পারবে না? কেন?
> সীতানাথ।। কী জানি? হয় তো ভয়ে।
> শরদিন্দু।। কিসের ভয়?
> সীতানাথ।। যুক্তির ভয়। বুঝলে যুক্তি আসে। যুক্তি এলে তাকে মানতে হয়। মানলে যুক্তি এগোয়। সিদ্ধান্তের দিকে এগোয়। সিদ্ধান্তকে মানুষ ভয় করে।
> শরদিন্দু।। কী সিদ্ধান্ত?
> সীতানাথ।। শেষ সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপরে আর যুক্তি নেই। হয় সিদ্ধান্ত মানো, না হয় যুক্তিকে অস্বীকার করতে করতে পিছু হটো।"[২২]

অর্থাৎ যারা জীবনের এই চরম সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে, তাদের কিন্তু কোনো বেদনা আঘাত হানতে পারে না। জানবার কোনো ইচ্ছাও জাগে না তাদের। কিন্তু যারা সীতানাথের মতো সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে জীবনের অর্থ সন্ধান করে ফেরে জানবার বেদনা তো তাদেরই অধিক। তারাই তো একাকী। বাস্তবিকই, নিছক বিশ্বাসের উপর ভরসা করে যদি মানুষ পথ চলে তাহলে তার জ্ঞানের পথ কিন্তু রুদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে দেখা গেল যদি কেউ 'কেন'-এর উত্তর খুজতে শুরু করে তাহলে তার জানার ক্রিয়াও শুরু হয়। তাই 'কেন' এই সংশয়বাচক পদ পরোক্ষভাবে হলেও জ্ঞানের উদ্বোধক। লুপ্তবিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিরা যুক্তিহীন-বিশ্বাসের গুণকীর্তন করে থাকেন। তাদের সামনে এই সত্য তুলে ধরা যায় যে, যুক্তিহীন বিশ্বাসের কারণে মনে স্থিরতা ও প্রাণে দৃঢ়তা আসলেও মননে স্থবিরতা আসতে বাধ্য। আমাদের মনে পড়বে 'কপালকুণ্ডলা'তে দৃঢ় কপালিকের কথা। যে কিনা দেবীর সামনে নরমুণ্ড ছেদ করে থাকে অতিবিশ্বাসে ভর করেই। তেমনি সমাজনীতির প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাসের কারণেই রক্তমাংসের রোহিণীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল গুলিবিদ্ধ হয়ে। আবার রামায়ণেও দেখি, প্রজাগণের স্থূলবুদ্ধিতে বিশ্বাস রেখে নিজ স্ত্রীকে অগ্নিপরীক্ষা করাতেও দ্বিধা করে না প্রজামনোরঞ্জক অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। সেখানেও কাজ করেছিল রাজানুষদদের প্রতি তাঁর অহংপূর্ণ বিশ্বাসই। কিম্বা স্নেহময়ী জননী কোলের সন্তানকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় শুধু দেবনির্ভরতার প্রতি বিশ্বাস রেখেই। তাই

বিশ্বাস যেখানে আত্মাকে অন্ধ ও মনকে সংকুচিত করে তোলে; পরিবর্তে সংশয় সেখানে আত্মাকে চক্ষুষ্মান ও মনকে উদার করতে সাহায্য করে। তাই 'কেন' এই সংশয় আমাদের জানার পথকে প্রশস্ত করে; সংকীর্ণ নয়। জানার জন্য তাই সংশয়েরও মূল্য অধিক বৈ কম নয়।

এছাড়াও আমাদের মনে পড়বে নিতাই কবিয়ালের কথা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের নিতাই। এক্কেবারে শেষ দৃশ্য। গ্রামে ফিরে এসেছে নিতাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল ও গ্রামের আরো সকলে স্টেশনে স্নেহ সমাদার সঞ্চয় করে অপেক্ষা করছে। নিতাইয়ের চোখে জল। বিপ্রপদ মারা যাওয়ার জন্য নীরব বিগলিত অশ্রুধারায় কবিয়াল যতটা না সিক্ত, তার অধিক সকলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তার চোখে জল এল। কিন্তু তার পরিচিত কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় গিয়ে যখন রাজন ভাইয়ার সঙ্গে বসল এবং ঠাকুরঝির খবর নিয়ে জানতে পারলো যে ঠাকুরঝি মারা গেছে, তখন বুকের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল কবিয়ালের। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসলো। আর অনিমেষ পলকে তাকিয়ে রইল–

> "লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয় সেইখানে।"[২৩]

কান্নার মধ্যেও মুখে হাসি ফুটিয়ে নিতাই গান ধরতে বাধ্য হয় —

> "এই খেদ আমার মনে—
> ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলালো না এ জীবনে।
> হায়— জীবন এত ছোট কেনে?
> এ ভুবনে?"[২৪]

আর নিতাইয়ের সামনে এই যে— একদিকে মৃত্যু আর একদিকে প্রেম – এই দুইয়ের মাঝখানে পড়ে জীবনের মানে খোঁজা, জীবনকে জানাই তার অন্তিম অভীপ্সা। অবশ্য সে-জানা কিন্তু ঠাকুরঝির মৃত্যুর স্বাভাবিকতায় বিশ্বাস রেখে জানা নয়। ঠাকুরঝির মৃত্যুর নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা স্মৃতি, সংশয়, ভ্রম ও তর্কের সহিত জানা। 'কেন'-র উত্তর খোঁজার জন্য এই জানা। জীবন তার কাছে ছোট নয়। জীবন সমুদ্রে উত্তাল যে প্রেমতরঙ্গ তার স্থায়িত্ব নিতাইয়ের জীবনে খুব কম সময় কেন- সেই না-জানাই তো তাকে বলতে বাধ্য করেছে— "হায়– জীবন এত ছোট কেনে?"[২৫] তাই রাজন শুধালেও নিতাই এর উত্তর দিতে পারে না। আর এটাই তো নিতাইয়ের মত সত্তার অধিকারী মানুষদের 'জানিবার গাঢ় বেদনা'। যা একাকী করে দেয়। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে যে নিতাই-সত্তা আছে সেও এই 'জানিবার বেদনা'য় এইভাবে একাকী হয়ে পড়ে জীবনে।

পাশাপাশি আমাদের মনে পড়বে আর এক বিষণ্ণ চরিত্রের কথা। সে শশী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী। পেশায় ডাক্তার। কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধ কোনো কিছুর অভাব ছিল না তার। সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতা তার ছিল যথেষ্টই। ছিল জীবনের প্রতি সহানুভূতিমূলক বিচারপদ্ধতিও। বুদ্ধি সংযম সব। এমনকি সংসারের টিকে থাকবার জন্য দরকারি সমস্ত গুণগুলি আমরা দেখে থাকব শশীর মধ্যে। কিন্তু এই শশী যখন কাহিনির শেষে গ্রামে ফিরে আসে, তখন তাকে আত্মবিরোধময় এক সংকীর্ণ জীবন যাপন করতে হয়।

> "জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবাপুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল।"[২৬]

অর্থাৎ এই যে মানুষকে খুঁজে বেড়ানো – এক অর্থে তো মানুষের মনকে জানার বাসনা। আর সেই জানার অভাবে শশী আজ বিষন্ন। যে শশীর আধখানা মন কাম্য-জীবনের কথা ভাবতো; শিক্ষা, সভ্যতা, আভিজাত্যের আবেষ্টনীতে উজ্জ্বল কোলাহলমুখর এক জীবনকে প্রার্থনা করত; সেই শশী আজ একাকী। সে জানতে চায় গ্রামে যারা আছে তাদের মন।

জানতে চায় যারা ছিল তাদের মনকেও। এখানে তো শশী 'জানা-মানুষ'। তাই জানিবার বেদনায় সে দীর্ণ। এমনকি শশীর প্রেম তো যাযাবরের মতো নয়। সে প্রেম নীড়-প্রেম। যে প্রেম চেয়েছিল "এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবীকে, কিন্তু অবাস্তব নয়।"[২৭] তাই কাছে এসেছিল কুসুম। কিন্তু এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে আর মানুষেরই হাতে কাটা খালে তলিয়ে গেল সে নীড় বাধার স্বপ্ন। তাই আর –

> "তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।"[২৮]

আসলে 'একাকী' শশী 'এক' হতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। এটাই তার বেদনা। যা তাকে আরো একাকী করে তুলেছে। এহেন একাকীত্বের আর একটা ধরন দেখতে পাই অজিতেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' নাটকে। কালের ব্যবধান ও প্রজন্মগত ব্যবধান কিভাবে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও আগুন ধরায় পিতা প্রসন্ন ও পুত্র কালো সংলাপে তা প্রস্ফুটিত। যদিও নাটকের অন্তিমে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক অনেকটা মজবুত হতে দেখা যায়। পিতা প্রসন্নকে প্রণামে আত্মদোষ স্বীকার করার পর কালো তার একাকিত্বের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে থাকে –

> "আমার যা হওয়া উচিত আর যা হয়েছি এর মধ্যে অনেক যোজন তফাৎ। এ দুটো কোনদিনই মিলবে না। তখন অন্ধ ক্ষোভে আমার নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। যাদের সাথে কাজ করি, তাদের সঙ্গে পুরোপুরি এক হতে পারি না — যাদের সঙ্গে ছিলাম তারাও আমাকে ত্যাগ করেছে।"[২৯]

আর এই যে 'এক' না হতে পারার বেদনা – এই যে মানুষের হৃদয়কে ছুঁতে না পারার বেদনা — এই বেদনা বুঝি একটি প্রজন্ম থেকেও আরেকটি প্রজন্মে সংক্রামিত।

কথা শেষ - কেমন করে মানুষ 'একা' থেকে 'এক' হয় তার একটি নজির রেখে আমাদের আলোচনার ইতি টানব। পরিচিত একটি কবিতা- 'The Reaper'। কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। একা, নিঃসঙ্গ ও একাকী পার্বত্য মেয়ের দুঃখ গাথা এটি। কবি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন -

> "Behold her, single in the field
> Yon solitary Highland Lass!"[৩০]

জীবনের সুদূর প্রান্তরে পার্বত্য মেয়েটি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের স্মৃতিগুলি ও বর্তমান সুখ দুঃখকে সে কেটে চলেছে। আবার নতুন করে বুনেও চলেছে সে। নিজে নিজেই ফসল কাটছে আর বাঁধছে। আর করুণ সুরে নিরন্তর গেয়ে চলেছে সেই গান–

> "Alone She cuts and binds the grain, / And sings a melancholy strain;"[৩১]

তার গানের ভাষা এক হতে চাওয়া সত্তা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। কবির আকুল জিজ্ঞাসা–

> "Will no one tell me what She sings?"[৩২]

কেউ কি আমায় বলবে সে কি গাইছে? যদিও মেয়েটির কণ্ঠের গানের কথায় লেগে আছে পরিচিত দিনের অতি সাধারণ দুঃখ যন্ত্রণা ও হারানো বেদনার অনুভব। কিন্তু এ গান কখনো থেমে থাকতে পারে না, থাকবেও না–

> "As if her song could have no ending;"[৩৩]

আরো আরো বেদনায় নিঃসঙ্গ মেয়ের গানের মধ্যে দিয়ে কবি সত্যিই নিজের নিঃসঙ্গতাকে, একাকীত্বকে চিনতে পারলেন। 'একা' থেকে এক হলেন। তাইতো তিনিই বলতে পারলেন–

> "The music in my heart that I bore,
> Long after it was heard no more."[৩৪]

সত্যিই তো আমাদের বেদনার্ত মনের মধ্যে এক একজন করে 'সলিটারি রিপার' (নিঃসঙ্গ কাটিয়ে) আছে; যে আমাদের জীবনের শূন্য প্রান্তে নত হয়ে একাকী ফেলে আসা সংশয়, তর্ক ও স্মৃতিগুলি কাটতে থাকে। জীবনের লেনা-দেনার

হিসেব নিকেশ করতে থাকে। জীবনের ভাঁড়ারকে ভরিয়ে তুলবে বলে অমেয় সংরাগে আশাগুলো জুড়তে থাকে। এইভাবে একদিন একা থেকে এক হয়। দূর হয় তার একাকীত্ব। আরও গভীরভাবে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। তাইতো এক হতে চাওয়া মন জীবন-নদীর তাতল সৈকতে দাঁড়িয়ে পারাপারের প্রতীক্ষায় বলে ওঠে –

"আমায় নিয়ে যাবি কে রে,
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।"[৩৫]

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত), জনপদাবলী (ইহবাদী লোকায়ত মানবমুখী বাংলা গানের সংকলন); পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৪৭
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জন, চতুর্থ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ২৫
৩. দাশ, জীবনানন্দ, বোধ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ; ভারবি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃ. ১৮
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, ২৯৪ সংখ্যক, পূজা পর্যায়, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী; নতুন সংস্করণ; বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ২৪
৬. প্রাগুক্ত, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৪৬
৭. তদেব, আট বছর আগের একদিন, পৃ. ৬৫
৮. মিত্র, শম্ভু, অয়দিপাউস ও পুতুল খেলা, ষষ্ঠ সংস্করণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৪৬
৯. দাশ, শিশির কুমার, সক্রেটিসের জবানবন্দী, প্যাপিরাস সং, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭; পৃ. ৫৯
১০. বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ), ১ম মূদ্রণ, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ২০০
১১. তদেব, পৃ. ২০০
১২. প্রাগুক্ত, বোধ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ১৯
১৩. তদেব, পৃ. ২০
১৪. তদেব, পৃ. ২০
১৫. তদেব, পৃ. ২০
১৬. প্রাগুক্ত, সুরঞ্জনা, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৪৮
১৭. প্রাগুক্ত, বোধ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ২০
১৮. তদেব, পৃ. ২০
১৯. তদেব, পৃ. ২০
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ঘরে বাইরে, রবীন্দ্র উপন্যাস-সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৮৬৪
২১. সরকার, বাদল, বাকি ইতিহাস: নাট্য সংকলন, বাউলমন প্রকাশন, যাদবপুর, ২০০১, পৃ. ৫১
২২. তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, বিংশ মূদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০৩, পৃ. ১৫৩
২৪. তদেব, পৃ. ১৫৪

২৫. তদেব, পৃ. ১৫৪
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, পুতুল নাচের ইতিকথা, সপ্তত্রিংশ মূদ্রণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ২১৪
২৭. তদেব, পৃ. ৭৫
২৮. তদেব, পৃ. ১৫৪
২৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতেশ, সওদাগরের নৌকা, রায় চৌধুরী, কৌশিক (সম্পাদিত), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৪; পৃ. ২৯
৩০. Wordsworth, William, The Reaper, Palgrave's Golden Treasury, 1st Edition; J.M. Dent & Sons Ltd. London, 1906; p. 277
৩১. Ibid, p. 277
৩২. Ibid, p. 278
৩৩. Ibid, p. 278
৩৪. Ibid, p. 278
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শেষ খেয়া, 'খেয়া', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩১৩; পৃ. ১৬